Rajshahi University journal of arts & law Vol. 48 (2020) pp. 15-25
ISSN 2309-0898

ভারতবর্ষে নারীবাদ এবং মুসলিম নারীজাগরণে রোকেয়ার ভূমিকা ও অবদান

সন্ধ্যা মল্লিক*

Abstract

The aim of this article is to show the origin of the feminist movement in India, and in this context, reveal the nature of multifaceted briliancies of Begum Rokeya. Feminist thought arose in this subcontinent under the influence of the west. Its development in the Muslim society was much delayed compared to the Hindu society. Rokeya was the pioneer of women's awakening in Muslim society. She recognized education as a way of women's self development. Rokeya procured to improve the status of Muslim women in society by writing literature and taking part in social activities. Her educational and social thoughts are manifested in her writings and life. In many other fields the radiance of her thought is diffused, but only these two aspects are highlighted here.

প্রাচীন ভারতের যে সময়কাল পর্যন্ত মোটামুটি জানা যায় তার সময়সীমা বৈদিকযুগ ধরলে ভারতীয় নারীদের এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায়। বৈদিক যুগে নারীরা জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করতো। বিশেষত উচ্চবংশীয় নারীরা স্বামীর সঙ্গে যজ্ঞাদিতে অংশ গ্রহণ করতো। শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীর অগ্রণী ভূমিকার কথা জানা যায় বেদ ও উপনিষদ থেকে। কাক্ষীবতী, ঘোষা, অপালা, বিশ্ববারা, বাক্, সুলভা, ব্রক্ষবাদিনী, লোপামুদ্রা, গার্গী, মৈত্রেয়ীর ন্যায় বিদুষী নারীর যেমন সাক্ষাৎ মেলে, তেমনি প্রাচীন লেখকদের রচনায় 'আচার্যা', 'উপাধ্যায়া' শব্দের ব্যবহার থেকে সে যুগে নারী শিক্ষকের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। তবে এঁরা ব্যতিক্রম। নারীদের সার্বিক অবস্থা এঁদের দ্বারা বোঝা যাবে না। আর্যদের আগমনের পর ধীরে ধীরে নারীরা স্বাধীনতা ও মর্যাদা হারাতে থাকে। মনু নারীর স্বতন্ত্র স্বাধীন অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন। মনুসংহিতায় উল্লেখ আছেঃ "পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।/রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।"[১] নিম্নবর্ণের নারীদের অবস্থা ছিল আরও খারাপ। প্রাচীনকালে নারীর সামাজিক অবস্থা প্রসঙ্গে পূরবী বসু বলেন, "প্রাচীনযুগে যথেষ্ট 'নারী স্বাধীনতা' ছিল বলে অনেকের যে ধারণা আছে, তা অনেকাংশে ভ্রান্ত বলে মনে করা হয়। নারী ছিল পুরুষের পুরোপুরি অধীন এবং তারই 'সম্পত্তি'। তবে নারীর জ্ঞানার্জনের পথটি তখন পর্যন্ত খোলা ছিল।"[২] প্রকৃত পক্ষে যুগে যুগে নারী পুরুষের বৈষম্য নানা রূপে বিদ্যমান ছিল এবং আছে। পুরুষ চিরকালই নারীকে একটি ছকবাঁধা পথে চালিত করতে চেয়েছে। নারীর করণীয় অকরণীয় নির্ধারণ করেছে পুরুষ। তবে সেই গণ্ডী পেরিয়ে চিরকাল কিছু নারী উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরকে ছুঁয়েছে, হয়ে উঠেছে পুরুষের সমকক্ষ। তারা মুক্তির ঝাণ্ডা উঁচু করে অন্যদের পথ দেখিয়েছে।

ইতিহাস ও সাহিত্যের পর্যালোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, আঠারো শতকের শেষ অবধি নারীকে অপরাপর বস্তুগত সম্পত্তির ন্যায় ব্যবহার করা হতো। মনোরঞ্জন থেকে শুরু করে ক্রয়-বিক্রয়ের সামগ্রী ছিল নারী। ধর্মের নামে নানা রকম বিধি নিষেধের দ্বারা পুরুষ শারীরিকভাবে যতখানি তার চেয়েও বেশি মানসিকভাবে নারীকে বন্দি ও পঙ্গু করেছে। মেয়ে সন্তানের স্বাধীন চলাচল জন্মের ৬/৭ বছরের মধ্যেই শেষ হতো। এরপর থেকে তাকে শেখানো হতো কি করে স্বামীর পাদোদক সেবন করে দিনের শুরু করতে হয়, কীভাবে সারাদিন চোখে ঠুলি এঁটে নিঃশব্দে সংসারের যাঁতাকল ঠেলতে হয় এবং

* সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫, ই-মেইলঃ sandhyamallick.ru@gmail.com

অবশেষে রাতে স্বামীর একান্ত অনুগত সেবাদাসী ও সহচরী হয়ে সাধ্বী স্ত্রী হতে হয়। এই শিক্ষা ভালোভাবে রপ্ত করে নারীর জীবন শুরু হতো। এরপর রুটিন মাফিক একই কর্মের পুনরাবৃত্তিতে জীবন থেকে একটি করে দিন খসে যেতো এবং মরণে নারীজন্ম সার্থক হতো। সমাজে নারীর এই হলো সাধারণ রূপ। এর অন্তরালে নারী সমাজের আর যে রূপ লুকিয়ে ছিল তা আরও ভয়ঙ্কর। নানা ধরনের নিপীড়ন আর অসম্মানে জর্জরিত ছিল বিধবা, সমাজচ্যুত নারীরা। এমনকি বন্ধ্যা ও কেবল মেয়ে সন্তানের জন্মদাত্রী মায়েরাও সেই নির্মমতা থেকে রেহাই পায়নি।

> বেদ থেকে মহাকাব্যের যুগে নারী প্রধানত বধূরূপে ও সন্তান (বিশেষত পুরুষ সন্তান) উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে চিত্রিত। পৌরাণিক যুগে নারীর অবমূল্যায়ন, অবমাননা, সহিংসতার শিকার হওয়া অতি সাধারণ ব্যাপার ছিল। সত্যি বলতে কী বেদ-পরবর্তী যুগে নারীর অবস্থার দিন দিন অবনতি ঘটেছে। বৌধায়নের *ধর্মশাস্ত্র*, মনু প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রকারদের রচনা, কৌটীল্যের *অর্থশাস্ত্র*, বাৎসায়নের *কামসূত্র*, কালিদাসের বিভিন্ন নাটক, বানভট্টের *কাদম্বরী* ও *হর্যচরিত*, হর্ষবর্ধনের নাটক *রত্নাবলী*, মাঘের *শিশুপালবধ*, দণ্ডির *দশকুমারচরিত*, শুদ্রকের *মৃচ্ছকটিক*, কলহনের *রাজতরঙ্গিনী* প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে নারীর দুরবস্থার কথা জানতে পারা যায়।[৩]

দেশ-কালভেদে সমস্যার বাহ্যরূপের পরিবর্তন ঘটে কিন্তু তার স্বরূপের বদল হয় না। তাই বিবর্তনের ধারায় প্রাচীন, মধ্য, আধুনিক সকল যুগে নারী-পুরুষের বৈষম্য ছিল। পুরুষ কর্তৃক নারীর প্রতি অবদমন বা নারীর মানবীয় মূল্যের অস্বীকৃতি ছিল এবং রয়েছে। কেবল বদলে গেছে ঐ প্রকার অবদমনের ফলে নারী যেসব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তার প্রকৃতি।

নারীর মানবসত্তার অবমাননায় যে সকল চিত্ত আর্দ্র হয়েছে তারা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এগিয়ে এসেছেন ভূলুণ্ঠিত মানবতার পুনঃপ্রতিষ্ঠায়। তাঁরা নারী সমাজের উপর পুরুষ সমাজের যে কোনো রকম অন্যায় আচরণকে প্রতিরোধের চেষ্টা করেছেন, এর কারণ অনুসন্ধান করেছেন, প্রতিকারের উপায় খুঁজেছেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টার ফলে একটি প্রত্যয় বা ধারণা মূর্ত রূপ লাভ করে যাকে নারীবাদ বলা যায়। "ঊনিশ শতকের প্রথম দিকে ফরাসী সমাজতন্ত্রী চার্লস ফুরিয়ের (Charles Fourier) Feminism কথাটি আবিষ্কার করেন।"[৪] নারীবাদের সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা প্রদান মোটেই সহজ নয়। কেননা সময় ও অবস্থার প্রেক্ষিতে ধারণাটি বিভিন্ন অর্থে বিভিন্ন গবেষক ও চিন্তাবিদ বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করেছেন। তবুও এর একটি সাধারণ রূপ রয়েছে। যার ভিত্তিতে সহজ কথায় বলা যায়– নারীবাদ এমন একটি তত্ত্ব যা নারীর প্রতি সকল রকম বৈষম্য ও নিপীড়নের কারণ ও ফলাফল বিশ্লেষণসহ তা নিরাকরণের উপায় খুঁজে বের করে নারীকে একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র মানবসত্তা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

নারীবাদের উৎপত্তির উৎস অনুসন্ধান করলে দেখা যায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক মনোভাবের মধ্যেই এর বীজ নিহিত। এ সকল ধারণা পাশ্চাত্যে প্রথম উন্মেষিত হয় এবং পরবর্তীতে আমাদের দেশের মুক্তমনা চিন্তাবিদগণকে বিশেষভাবে আলোড়িত করে। এ প্রসঙ্গে কনক মুখোপাধ্যায় বলেন:

> ...নবজাগরণের সময় থেকে আমাদের দেশে নারী প্রগতি ও নারী অধিকারের প্রশ্নটি সামনে আসে রামমোহন-বিদ্যাসাগর প্রমুখের নেতৃত্বে দীর্ঘ শতাব্দীব্যাপী যে সমাজ সংস্কার আন্দোলন হয় তার মধ্যে নারীদের প্রতি সামাজিক অন্যায় অবিচার বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন ছিল একটি প্রধান বিষয়। গৃহবন্দী ক্রীতদাসীর অবস্থা থেকে নারীকে একটি যুক্তিনির্ভর মানবিক ভূমিতে দাঁড় করানো ছিল তার বিশেষ লক্ষ্য।[৫]

এদেশে নারীবাদী চিন্তার উন্মেষলগ্নে রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাহসী ভূমিকা তৎকালীন নারী সমাজকে মুক্তির দিশা দেখিয়েছে। এঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পাশ্চাত্য ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ও বিদ্যমান পরিস্থিতির অযৌক্তিকতা অনুভব করে বহু ব্যক্তি এই স্রোতে নিজেদের গতি

সঞ্চারিত করে বহমান ধারাকে বেগবান করেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পুরুষ ব্যক্তিত্ব দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, অক্ষয়কুমার দত্ত, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, কিশোরী চাঁদ মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, গৌরদাস বসাক, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। নারীদের মধ্যে ছিলেন স্বর্ণকুমারী, কাদম্বিনী বসু, জ্ঞানদানন্দিনী, সরলা দেবী, অবলা বসু, জ্যোতির্ময়ী দেবী, উর্মিলা দেবী, কামিনী রায়, হেমপ্রভা মজুমদার, আশালতা সেন, প্রভাবতী বসু, সরমা গুপ্ত, সরযু দেবী, মনিকুন্তলা সেন, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, কৃষ্ণভাবিনী দাস প্রমুখ। স্বদেশী আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন কল্যানী দাস, কমলা দাসগুপ্তা, বীনা দাস, লীলা নাগ, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত প্রমুখ। এছাড়াও বহু সংখ্যক নারী-পুরুষের সক্রিয় অবদান ছিল এই নারী মুক্তি আন্দোলনে। এই রূপান্তরের পক্ষে নাম না জানা অগণিত সাধারণ মানুষের ছিল নীরব সমর্থন ও গোপন সহযোগিতা। বিধবা বিবাহের পক্ষে শান্তিপুরের তাঁতিরা এক প্রকার মৌন আন্দোলনের সূচনা করেন বিদ্যাসাগরপেড়ে শাড়ি তৈরি করে। ইতিমধ্যেই নবজাগরণের আভাস সমাজের বিভিন্ন স্তরের কিছু মানুষের মধ্যে দেখা যেতে শুরু করেছে। তার ফলে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে সমাজ সংস্কারকদের মধ্যে একটি সদর্থক মনোভাবের সৃষ্টি হয়। কনক মুখোপাধ্যায় অন্যত্র এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন:

> আমাদের দেশে নারীর অধিকার ও স্ত্রী-শিক্ষার আন্দোলনের সূচনা হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের যুগ থেকে। রামমোহন-বিদ্যাসাগর প্রমুখ সমাজ সংস্কারক মনীষীরা ছিলেন তার পুরোধা। রামমোহন রায়ের উদ্যোগে প্রথম সর্ববৃহৎ সমাজ সংস্কারের কাজ সতীদাহ বা সহমরণ প্রথা আইনগতভাবে নিষিদ্ধ হওয়ার (১৮২৯) মধ্য দিয়ে সমাজসংস্কারের পথে এ যুগের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ সূচিত হয়।[৬]

রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের প্রবল প্রতিরোধের মুখে ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ ও উদারনৈতিক মানবতাবাদী মনোভাবে ভাবিত কিছু সমাজহিতৈষীর আপ্রাণ চেষ্টা এবং ইংরেজ সরকারের আনুকূল্যে বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়। এর পূর্বেই আত্মীয় সভা (১৮১৫) গঠিত হয়েছিলো। এরপর ধীরে ধীরে ব্রাহ্মসমাজ (১৮৩০), তত্ত্ববোধিনী সভা, সর্বশুভকরী সভা, সুহৃদ সমিতি, বাল শুভকরী সভা, ব্রাহ্মবন্ধু সভা, বামাবোধিনী সভা, ব্রাহ্মিকা সমাজ (১৮৬৫), বামাহিতৈষী সভা (১৮৭১), বঙ্গীয় মহিলা সমাজ (১৮৭৯), আর্য নারী সমাজ (১৮৭৯), সখি সমিতি (১৮৮৬), নারী হিতৈষিণী সভা, ব্যাপটিস্ট মিশন, ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি প্রভৃতি সভা সমিতি, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে। এ সকল প্রতিষ্ঠান একদিকে সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে নারীমুক্তির পথকে সুগম করেছে অন্যদিকে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে নারীকে স্বাবলম্বী ও সোচ্চার হতে শিক্ষা দিয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শুরু হওয়া নবজাগরণের সুফল নারী সমাজের কাছে পৌঁছাতে দীর্ঘ সময় লেগেছিল। এ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে নারীর স্বাধিকার ক্রমান্বয়ে নানা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। "ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, এই সময়কালে বাঙালি হিন্দু নারীর সামাজিক ও আইনগত অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছিলো।"[৭] কিন্তু এটা ছিল অবিভক্ত বাংলার পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু সমাজে নারীর অবস্থা। বর্তমান বাংলাদেশ তথা তৎকালীন পূর্ববঙ্গের অবস্থা ছিল কিছুটা পশ্চাৎপদ "ঢাকায় দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি, দুর্গামোহন দাস, আনন্দমোহন বসু, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, বরদাচরণ হালদার, শ্রীনাথ চন্দ্র প্রমুখ নারী শিক্ষা ও নারীর অবস্থা উন্নয়নের প্রতি দৃষ্টি দেন। নারীশিক্ষা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ঊনিশ শতকের সত্তরের দশকেও ছিল অত্যন্ত পশ্চাৎপদ।"[৮] সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন (১৮৭৮) ও ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী (১৮৮৩) এ সময়ে নারী শিক্ষা প্রচলনে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়েও সামান্যই ফল পেয়েছে। সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন অপেক্ষা সুহৃদ সম্মিলনী শিক্ষা প্রসারে অধিক ভূমিকা রাখে। সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন অন্যান্য সামাজিক বিষয়ের সংস্কারে অধিক

গুরুত্ব দেয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর আটের দশকে পূর্ববঙ্গে নারীমুক্তি আন্দোলন ক্রমশ গতি লাভ করতে থাকে। এ সময় নারীদের নেতৃত্বে পত্রিকাদি সম্পাদনা, আন্দোলন, সংগঠন গড়ে তোলার কাজ চলতে থাকে। এছাড়াও নিজ নিজ এলাকায় শিক্ষাবিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন বরিশালের মনোরমা মজুমদার, কামিনী রায়, কুসুমকুমারী দাস, যশোরের মানকুমারী বসু প্রমুখ মহীয়সী নারী।

রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২) লক্ষ্য করেন হিন্দু সমাজে নারীবাদী আন্দোলন ক্রমশ ব্যপ্তি পেতে শুরু করলেও মুসলিম সমাজের অন্দরে তা একেবারেই নিষিদ্ধ হয়ে আছে। শিক্ষায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানে পুরুষ সমাজে এগিয়ে গেলেও নারীরা রয়েছে একেবারে অজ্ঞতার অন্ধকারে। হিন্দু নারীরা খানিকটা সুযোগ-সুবিধা পেলেও মুসলিম নারী সমাজ ছিল একান্ত অনগ্রসর। দুই-চার জন নারী যারা স্বচেষ্টায় মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে সে প্রয়াস পূর্ণতা পায়নি। এই পটভূমিতে রোকেয়া লেখনী ধারণ করেন। নারী পুরুষের মধ্যে যে বিস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিল তার উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন:

> স্বামী যখন পৃথিবী হইতে সূর্য ও নক্ষত্রের দূরত্ব মাপেন, স্ত্রী তখন একটা বালিশের ওয়াড়ের দৈর্ঘ্য প্রস্থ (সেলাই করিবার জন্য) মাপেন! স্বামী যখন কল্পনার সাহায্যে সুদূর আকাশে গ্রহনক্ষত্রমালা বেষ্টিত সৌরজগতে বিচরণ করেন, সূর্যমণ্ডলের ঘনফল তুলাদণ্ডে ওজন করেন এবং ধূমকেতুর গতি নির্ণয় করেন, স্ত্রী তখন রন্ধনশালায় বিচরণ করেন, চাউল ডাল ওজন করেন এবং রাঁধুনীর গতি নির্ণয় করেন।[৯]

তিনি অবরুদ্ধ নারীর দুরবস্থার বর্ণনা, শারীরিক-মানসিক দাসত্বের কারণ এবং কি উপায়ে নারীর মুক্তি ঘটা সম্ভব তা যুক্তি ও শ্লেষের মাধ্যমে লিখতে থাকেন। তাঁর এ সকল লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। আর এর মাধ্যমেই তিনি মুসলিম সমাজে নারীবাদী আন্দোলনের সূচনা ঘটান। শাহানারা হোসেন অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় রোকেয়াকে মুসলিম নারী মুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ ও তাঁর *মতিচূর* গ্রন্থের প্রকাশ কালকে এ আন্দোলনের প্রারম্ভকাল বলে উল্লেখ করেন। তাঁর ভাষায়:

> বাঙালি মুসলিম নারীদের মুক্তি আন্দোলনের প্রবর্তন করেন বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। এই আন্দোলনের সূচনাকাল রোকেয়া লিখিত প্রবন্ধ সংকলন *মতিচূর প্রথম খণ্ড* প্রকাশনার তারিখ ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। সেই সঙ্গে *মতিচূর প্রথম খণ্ড* -এর প্রকাশনা বাঙালি মুসলিম সমাজের বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসেরও এক যুগান্তকারী ঘটনা। মতিচূর প্রথম খণ্ড কূপমণ্ডূক, সঙ্কীর্ণচেতা বাঙালি মুসলিম সমাজে সূচনা করেছিল এক উদার ও মুক্ত চিন্তাধারা।[১০]

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, নবজাগরণের বিকাশ অবিভক্ত বাংলার সকল স্থানে ও সমাজে সমানভাবে হয়নি। তৎকালীন পূর্ববঙ্গ ও মুসলিম নারী সমাজ পিছিয়ে ছিল অনেকখানি। হিন্দু সমাজের তুলনায় প্রায় পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় লেগেছিল মুসলিম নারী সমাজে নবজাগরণের ছোঁয়া লাগতে। নবজাগরণের কালে মুসলিম নারী সমাজের শিক্ষার সার্বিক অবস্থা একটি ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয়। কলকাতার Bengal Social Science Association – এর এক সভায় শিক্ষা বিষয়ে আবদুল লতিফ একটি নিবন্ধ পাঠ করেন। এ প্রসঙ্গের আলোচনাপর্বে প্যারীচাঁদ মিত্রের এক প্রশ্নের জবাবে কলকাতা মাদ্রাসার মৌলবী আবদুল হাকিমের উত্তর ছিল এমন: 'নারী-পুরুষ উভয়ের শিক্ষার প্রয়োজন থাকলেও মুসলিম নারীর জন্য গৃহের বাইরে গিয়ে শিক্ষা লাভের প্রয়োজন নেই। গৃহের অভ্যন্তরে লব্ধ শিক্ষা তাদের জন্য যথেষ্ট।'[১১] প্রকৃতপক্ষে মৌলবী আবদুল হাকিমের মুখে উচ্চারিত হয়েছে তৎকালীন মুসলিম সমাজের মতের প্রতিধ্বনি। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অথবা গৃহের বাইরে যাওয়া কোনোটাই ইসলামে নিষিদ্ধ না হলেও ধর্মের নামে তা মুসলিম নারী সমাজের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেনের ন্যায় পুরুষ ব্যক্তিত্ব স্বীয় সমাজের নারীর দুরবস্থা লাঘবে যখন সচেষ্ট তখন মুসলিম সমাজে অনুরূপ পুরুষ ব্যক্তিত্বের অভাব ছিল সুস্পষ্ট। নবজাগরণের প্রভাবে যে সব মুসলমান ইংরেজি শিক্ষার আবশ্যকতা অনুভব করেছিলেন, তারাও নিজ সমাজের নারীর উন্নতি নিয়ে একেবারেই ভাবিত ছিলেন না।

এরূপ অবস্থায় বর্তমান বাংলাদেশের রংপুরে রোকেয়ার জন্ম। রোকেয়ার পরিবার ছিল কট্টর রক্ষণশীল। কিন্তু এই রক্ষণশীলতার কড়া পাহারার অলক্ষিতে একটি উদারনৈতিক ভাবধারা এই পরিবারের মধ্যে ইতিপূর্বেই প্রবাহিত হয়েছিল। রোকেয়ার বড় ভাই ইব্রাহিম সাবের ছিলেন স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী ও নবজাগরণের আলোয় আলোকিত মানুষ। তিনি করিমুন্নেসা ও রোকেয়া দুই বোনকেই গোপনে শিক্ষিত করে তোলেন। বিবাহোত্তর জীবনে রোকেয়া স্বামীকে পেয়েছিলেন সহযোগীরূপে। রোকেয়া তাঁর বিহারী স্বামীকে বাংলা শিখতে সাহায্য করতেন আর স্বামী তাঁকে পড়ালেখা ও সাহিত্যচর্চায় উৎসাহ যোগাতেন। সাখাওয়াত হোসেন শিক্ষিত ও বিদ্যানুরাগী হওয়ায় রোকেয়ার মননশীলতার যথাযথ মর্যাদা দিয়েছিলেন। রোকেয়ার অধিকাংশ রচনা স্বামীর জীবদ্দশাতেই রচিত। সাখাওয়াত হোসেন রোকেয়ার প্রতিভা ও শিক্ষাবিস্তারে তাঁর আগ্রহ লক্ষ্য করে স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁকে দশ হাজার টাকা প্রদান করেন। পরবর্তীকালে রোকেয়া হয়ে ওঠেন মুসলিম নারী জাগরণের পথিকৃৎ। তাঁর লেখনী ও কর্মতৎপরতার কারণেই মুসলিম নারীর অবস্থা পরিবর্তনের আবশ্যকতা সমাজ অনুভব করে। "... বেগম রোকেয়াই প্রথম বাঙালি মুসলমান যিনি নারীদের পুরুষের সাথে সমঅধিকার ও সমমর্যাদা লাভের প্রশ্নটি তার লেখনীর মাধ্যমে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে সর্বসমক্ষে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছিলেন এবং এভাবে বাঙালি মুসলিম সমাজের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন।"[১২]

রোকেয়ার লেখকসত্তা স্বকীয়তায় ভরপুর। অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদর্শিতা উভয়ই তাঁর মধ্যে ছিল প্রবল। তাই মুসলিম নারী সমাজের নিগ্রহের যে রূপ তিনি তুলে ধরেছেন তা সার্বিকভাবেই বস্তুনিষ্ঠ। অথচ তিনি নিজেও কঠোর পর্দা প্রথার কারণে সমাজের সবটুকু চর্মচোখে দেখতে পারেননি। যা দেখেছেন সেটুকু মানবিক অনুভূতি আর অন্তর্দৃষ্টির ফলে সর্বজনীন হয়ে উঠেছে। তিনি বলেছেন, "আমি আজীবন কঠোর সামাজিক 'পর্দার' অত্যাচারে লোহার সিন্দুকে বন্ধ আছি-ভালরূপে সমাজে মিশিতে পাই নাই।"[১৩] অথচ তাঁর রচনাগুলো সমস্তই এই সমাজকে কেন্দ্র করে। সমাজের নানা রকম কুসংস্কার, কুপ্রথা, বৈষম্য, ধর্মের নামে শোষণ–সবই চিত্রিত হয়েছে তাঁর সাহিত্যে। রোকেয়ার *মতিচূর* (১ম ও ২য় খণ্ড), *অবরোধবাসিনী*, *পদ্মরাগ* গ্রন্থগুলো ছাড়াও বেশ কিছু সংখ্যক প্রবন্ধ ও কবিতাও রয়েছে। এছাড়া রয়েছে *Sultana's Dream*, ইংরেজি প্রবন্ধ, বিভিন্ন সভা সমিতিতে প্রদত্ত ভাষণ ও বিভিন্ন জনকে লেখা তাঁর পত্রাদি। এ সকল রচনা থেকে সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর সার্থকতা যাচাই করা যায়। তৎকালে নারী সমাজের অবস্থার প্রেক্ষিতে তাঁর সাহিত্য রচিত। নারীর অবস্থার ব্যাপক পবির্তনের সাথে সাথে রোকেয়ার সাহিত্যের কদর কমে যাওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু রোকেয়ার সাহিত্যের সমাদর বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। দুটি কারণে এরূপ হওয়া সম্ভব। প্রথমতঃ শিক্ষিত সমাজ বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করে শত বিপত্তি সত্ত্বেও রোকেয়া বাংলা ভাষাতেই সাহিত্য রচনা করেছেন। তাঁর ভাষাজ্ঞান, সমস্যার স্বরূপ বিশ্লেষণ, সমাধানের উপায় নির্দেশ এবং সর্বোপরি মানব চেতনার বন্ধ দুয়ারে সজোরে নাড়া দেওয়ার প্রবল ক্ষমতা অনুভব করে পাঠক আজও মুগ্ধ হয়। দ্বিতীয়তঃ যদিও তিনি কোনো নিজস্ব রচনারীতি গড়ে তোলেননি তবু সাহিত্যরস পরিবেশনের এক বলিষ্ঠ ও চিরন্তন শৈলী তাঁর রচনায় খুঁজে পাওয়া যায়। সমাজচিত্র রূপায়নে তিনি যুক্তি, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতা, ভাবের গভীরতা–সকল কিছুর সার্থক সমন্বয় ঘটিয়েছেন। তাঁর উদাত্ত আহ্বানে বিচলিত হয়েছে নারীস্বাধীনতার পক্ষের ও বিপক্ষের উভয় শ্রেণি। একদল আগল খুলে বেরিয়ে এসেছে, অন্যদল তীব্র ভাষায় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। তাঁর সাহিত্য আজও নারীকে পথ দেখায় আর প্রতিক্রিয়াশীলের অন্তরে ভয়ের শিহরণ জাগায়। রোকেয়ার সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর সমাজ ভাবনা, শিক্ষা ভাবনা, দার্শনিক চিন্তা। তাঁর সাহিত্য নারীকে নিজেকে চিনতে শেখায়, সমাজের অচলায়তনে লাগায় কম্পন আর বিবেকবান মানুষের অন্তরে জ্বালায় যুক্তির আগুন; যে আগুনে পুড়ে কলুষমুক্ত হতে পারে সমাজ।

বাংলা সাহিত্যের পরিমণ্ডলের বাইরে রোকেয়া স্বরূপের উন্মোচন অত্যন্ত সীমিত। রোকেয়া কেবল নারীবাদ বা স্ত্রীশিক্ষার প্রচার প্রসারে লেখনী ধারণ করেছিলেন তাই নয়, শিক্ষাবিস্তারে ও নারীমুক্তি আন্দোলনে তাঁর যে কর্মোদ্যোগ, বিদ্যালয় নির্মাণ, ছাত্রী সংগ্রহ, বিভিন্ন সভা-সমিতি গঠন তা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। শত বাঁধনের বেড়াজাল অতিক্রম করে এই কর্মপ্রয়াস চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন অসীম সাহস, অটুট মনোবল, দৃঢ় সংকল্প ও অদম্য কর্মস্পৃহার। তাই রোকেয়া কেবল তাত্ত্বিক লেখক নন; তিনি কর্মবীর, সক্রিয় যোদ্ধা এবং সেনাপতিও বটে। কেননা তাঁর নেতৃত্ব ও আদর্শে চালিত হয়েছেন বহুজন। রোকেয়ার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কর্মযজ্ঞ সম্পাদনে হাত মিলিয়ে অনেকেই হয়েছেন সহযোদ্ধা। রোকেয়ার পরিচয় এখানেই সীমিত নয়। তিনি সমাজসংস্কারক, শিক্ষাবিদ ও নারীবাদী দার্শনিক। রোকেয়া এক বিদ্রোহী নারী। প্রতিপক্ষ যখন অমিত শক্তিধর তখনও অন্যায়ের সাথে আপোস না করে তিনি প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন। নারীর প্রতি সমাজের অন্যায্যতার বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী বিন্দুমাত্র কম্পিত হয়নি। বহুমাত্রিক গুণের সমাবেশে রোকেয়া সাহিত্যের পরিমণ্ডলকে ছাড়িয়ে ব্যাপ্ত হয়েছেন আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে। একই সাথে তাঁর মননজাত সত্যকে বাস্তবে রূপদানে যে উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা তিনি চালিয়েছেন তার জন্য তাঁকে মুসলিম নারী সমাজে রাজা রামমোহন রায়ের সাথে তুলনা করা অযৌক্তিক নয়।

যুগে যুগে আমাদের পুরুষ লেখকগণ নারীকে নানা গুণে ভূষিত করে যে আদর্শ চিত্রিত করেছেন, তাকে বলেছেন ভারতীয় তথা বঙ্গনারীর শাশ্বত রূপ। মেয়ে সন্তানকে সেই আদর্শচিত্রের অনুলিপি করে গড়ে তোলার জন্য যেখানে যা ছাটাই করা অথবা যুক্ত বা প্রলেপ দেওয়া প্রয়োজন তা করতে তারা কসুর করেননি। এতে সেই কন্যা সন্তানের মানসিক মৃত্যু বা বিকৃতি কোনোটিই তার অভিভাবকের নিকট বিচার্য হয়ে ওঠেনি। মেয়ে সত্য নয়, ঐ আদর্শই সত্য। ঠিক যেন প্লেটোর প্রত্যয় তত্ত্ব! এরই বিপরীতে রোকেয়ার অবস্থান। দীর্ঘদিনের অবদমিত সত্তার অবস্থা বর্ণনা করে তিনি বলেন, "...বহুকাল হইতে নারীহৃদয়ের উচ্চবৃত্তিগুলি অঙ্কুরে বিনষ্ট হওয়ায় নারীর অন্তর, বাহির, মস্তিষ্ক, হৃদয় সবই "দাসী" হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর আমাদের হৃদয়ে স্বাধীনতা, ওজস্বিতা বলিয়া কোনো বস্তু নাই–এবং তাহা লাভ করিবার প্রবৃত্তি পর্যন্ত লক্ষিত হয়না।"[১৪] তিনি এই মোহনিদ্রা ভেঙ্গে জেগে ওঠার আহ্বান জানান। এরূপ জাগৃতি সুকঠিন জেনে নারীর প্রতি তাঁর আবেদন, "প্রথমে জাগিয়া উঠা সহজ নহে, জানি; সমাজ মহা গোলযোগ বাধাইবে জানি; ...কিন্তু সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত জাগিতে হইবেই।"[১৫] তিনি বলেছেন, ভালো কাজ কখনও বিনা ক্লেশে সম্পাদিত হয় না। এমনকি ভালো কাজ প্রায়শই বর্তমান কালে নিন্দিত হয়ে থাকে–সে কথাও তিনি নারীকে বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

রোকেয়ার দর্শন তাঁর সাহিত্য ও কর্মের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। নারী প্রসঙ্গে তিনি প্লেটোর অসমাপ্ত বক্তব্যের সমাপ্তি টেনেছেন। প্লেটো বলেছিলেন, উপযুক্ত শিক্ষা পেলে নারীও তার আদর্শ রাষ্ট্রে শাসকের ভূমিকা পালন করতে পারে। প্লেটোর সময়কালে মেয়েদের যখন নাগরিক অধিকার স্বীকৃত নয়, তখন শাসক হিসেবে নারীর এই স্বীকৃতি দুঃসাহসই বটে! অনুরূপ সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে মুক্ত কণ্ঠে রোকেয়া বলেন, নারীরা সুযোগের অভাবে আজও পুরুষের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারলো না। তাঁর ভাষায়: "...এবং আমরা বহুকাল হইতে দাসীপনা করিতে করিতে দাসত্বে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। এইরূপে আমাদের স্বাবলম্বন, সাহস প্রভৃতি মানসিক উচ্চবৃত্তিগুলি অনুশীলনের অভাবে বার বার অঙ্কুরে বিনাশ হওয়ায় এখন আর বোধ হয় অঙ্কুরিত হয় না।"[১৬] তিনি আরও বলেন,

> ...প্রকৃত সুশিক্ষা চাই-যাহাতে মস্তিষ্ক ও মন উন্নত (brain and mind cultured) হয়। আমরা উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে সমাজও উন্নত হইবে না। যতদিন আমরা আধ্যাত্মিক জগতে, পুরুষদের সমকক্ষ না হই, ততদিন পর্যন্ত উন্নতির আশা দুরাশা মাত্র। আমাদিগকে সকল প্রকার জ্ঞানচর্চা করিতে হইবে।[১৭]

রোকেয়া উপলব্ধি করেছিলেন, মস্তিষ্ক ও মনের শক্তির পরিস্ফুটনই শিক্ষা। পুরুষগণ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের মাধ্যমে আত্মশক্তির বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হচ্ছে। অথচ নারীগণ পর্দার নামে চির অবরুদ্ধ থেকে শিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। নারী সুযোগের অভাবে এবং সংসারের কর্মভারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে অক্ষম হয়েছে। রাজা রামমোহন রায়ের লেখাতে অনুরূপ মতের প্রকাশ ঘটেছে।

রোকেয়া নারীকে চিরন্তন শাশ্বত আদর্শের নামে বন্দি করার তীব্র প্রতিবাদ করেন। প্রত্যেক নারীর ব্যক্তিসত্তার স্বাতন্ত্রের স্বীকৃতি তাঁর রচনার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। রোকেয়া আহ্বান জানান, আত্মজাগরণের মাধ্যমে নারী তার স্বীয় অস্তিত্বের বিকাশ ঘটাক। অস্তিত্ববাদী নারীবাদের প্রবক্তা Simone de Beauvoir–এর দর্শনে এই প্রত্যয়েরই প্রকাশ। সিমন নারীর স্বীয় অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠায় চারটি কৌশলের কথা বলেন। এর প্রথমটিই হলো নারীর অর্থকরী কর্মগ্রহণ করা। সিমনের কৌশলের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় রোকেয়ার নিম্নোক্ত বক্তব্যে:

> পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডীকেরানী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডীমাজিস্ট্রেট, লেডীব্যরিস্টার, লেডীজজ-সবই হইব। ...উপার্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, না পা নাই? না বুদ্ধি নাই? কি নাই? যে পরিশ্রম আমরা "স্বামী"র গৃহকার্যে ব্যয় করি সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসায় করিতে পারিব না?[১৮]

এই প্রবন্ধেই তিনি উল্লেখ করেছেন কর্মক্ষেত্রের অভাব নেই। প্রয়োজনে নারী কৃষিকাজ করবে। অন্ন-বস্ত্রের জন্য অন্যের দাসী হওয়া অপেক্ষা স্বাধীনভাবে উপার্জন করে নিজের ভরণ-পোষণ অধিক সম্মানের। বিয়ে দিয়ে কন্যাকে চিরদাসে পরিণত না করে তাকে শিক্ষিত করে তুলতে ও উপার্জনে উৎসাহী করার জন্য পিতা-মাতার নিকট রোকেয়া আবেদন রেখেছেন। তিনি বলেন, "ভারতে বর দুর্লভ হইয়াছে বলিয়া কন্যাদায়ে কাঁদিয়া মরি কেন? কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিতা করিয়া কার্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দাও, নিজের অন্নবস্ত্র উপার্জন করুক।"[১৯] রোকেয়া নারীকে জ্ঞানে, শিক্ষায়, কর্মে পুরুষের সমকক্ষ হতে বলেছেন। টীকায় সমকক্ষতার ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বলেছেন, যেরূপ উন্নতি সাধনে সমাজে পুরুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অনুরূপ উন্নতি নারীদেরকেও অর্জন করতে হবে। স্বাধীন মতপ্রকাশ, বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা এবং সর্বোপরি ছকে বাঁধা নারী না হয়ে মানুষ হওয়ার কথা বলেন তিনি।

রোকেয়ার অপর এক পরিচয় তিনি শিক্ষাবিদ। তাঁকে কেবল স্ত্রীশিক্ষার অগ্রদূত রূপে চিহ্নিত করা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতার প্রকাশ। শিক্ষা কী? কেন?, কীভাবে?, কাদের জন্য? –তার জবাব রোকেয়ার রচনা ও ভাষণগুলোর মধ্যে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। "স্ত্রীজাতির অবনতি" শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেন, "..."শিক্ষার" অর্থ কোন সম্প্রদায় বা জাতি বিশেষের "অন্ধ-অনুকরণ" নহে। ঈশ্বর যে স্বাভাবিক জ্ঞান বা ক্ষমতা (faculty) দিয়াছেন, সেই ক্ষমতাকে অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি (develop) করাই শিক্ষা।..."পাস করা বিদ্যা"কে প্রকৃত শিক্ষা বলি না।"[২০] শিক্ষার এর চেয়ে ব্যাপক কোনো সংজ্ঞা বিরল। শিক্ষা ছাড়া চর্মচক্ষু দৃষ্টিশক্তির অধিকারী হয়েও যে চিরঅন্ধ, সে কথা তিনি এ প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। সমাজের একাংশ নারী এভাবে অন্ধ হয়ে সমাজকে পিছিয়ে রেখেছে এ কথা তিনি শতবার উল্লেখ করেছেন। শিক্ষাই হলো অন্ধত্ব মোচনের একমাত্র উপায়। রোকেয়া মনে করেন, তাঁর সমকালে শিক্ষার সর্বাধিক প্রয়োজন ছিল নারী সমাজের। শিক্ষাবিদ রোকেয়ার অন্তরে বাংলা ভাষার জন্য ছিল অকৃত্রিম মমত্ব। উদীয়মান বাঙালি মুসলমানের ভাষা বাংলা হবে– একথা রোকেয়া অনুভব করেছিলেন। সামান্য সম্পদ নিয়ে যে বিদ্যালয় তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেখানে দীর্ঘদিন (১৪ বছরের অধিককাল) বাংলা বিভাগ চালু করতে না পারার আক্ষেপ ছিল তাঁর। বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দূরদর্শী শিক্ষাবিদ রোকেয়ার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে। রোকেয়া সকল প্রকার কুসংস্কার, বন্ধন,

অন্ধত্ব আর পরাধীনতার গ্লানি মোচনের উপায় হিসেবে শিক্ষাকেই হাতিয়ার বলে মনে করেন। বিশেষভাবে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে তাঁর ভাবনা ছিল নিরন্তর। মেয়েদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের আবশ্যকতা রয়েছে বলেই তিনি মনে করতেন। তাই তাদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মতো স্বপ্নকে তিনি লালন করেছেন আপন অন্তরে, বাস্তবায়ন করতে পারেননি অর্থাভাবে। তিনি সুধীজনের নিকট প্রশ্ন রেখেছেন, "আমাদের জন্য স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় (University) হওয়া এবং পরীক্ষক স্ত্রীলোক হওয়া কি অসম্ভব?"[২১]

বিদ্যোৎসাহী রোকেয়া ছাত্রী সংগ্রহের জন্য যে পরিমাণ শ্রম ও মেধা ব্যয় করেছেন তা অপরিমেয়। বাড়ি বাড়ি ঘুরে অভিভাবকদের বুঝিয়েছেন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। রোকেয়া তাদের কন্যা সন্তানকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে পাঠাতে অনুরোধ করেছেন। মেয়েদের পর্দা রক্ষা ও নিরাপত্তা প্রদানের অঙ্গীকার করেছেন। মেয়েদের স্কুলে যাতায়াতের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা– সবই করেছেন তিনি। ধর্মের নামে, পর্দার নামে শিক্ষা থেকে নারীকে বঞ্চিত রাখার অপপ্রয়াস বন্ধে তিনি ধর্মের যথাযথ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। ইসলাম যে নারী শিক্ষার বিরোধী নয় তা তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন:

> ...যিনি সর্বপ্রথমে পুরুষ স্ত্রীলোককে সমভাবে সুশিক্ষা দান করা কর্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তিনি আমাদের রসুল মকবুল (অর্থাৎ পয়গাম্বর সাহেব)। তিনি আদেশ করিয়াছেন যে, শিক্ষালাভ করা সমস্ত নরনারীর অবশ্য কর্তব্য। তের শত বৎসর পূর্বেই আমাদের জন্য এই শিক্ষাদানের বাধ্যতামূলক আইন পাশ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদের সমাজ তাহা পালন করে নাই, পরন্তু ঐ আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে এবং তদ্রূপ বিরুদ্ধাচরণকেই বংশ-গৌরব মনে করিতেছে।[২২]

মুসলিম সমাজ দেরীতে হলেও আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল। তবে সে উপলব্ধি কেবল পুরুষদের জন্য। স্ত্রীশিক্ষা ব্যাপারে তাদের মত, সন্তান পালনে যতটুকু শিক্ষা আবশ্যক তা গৃহেই সম্ভব। মুসলমান মেয়ের বিদ্যালয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। মুসলিম সমাজের অগ্রগামী অংশের স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে এমন মনোভাব তাদের দুর্ভোগের কারণ। রোকেয়া বলেন, "মুসলমানদের যাবতীয় দৈন্য-দুর্দ্দশার একমাত্র কারণ স্ত্রী শিক্ষায় ঔদাস্য।"[২৩]

রোকেয়া যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন পর্দা প্রথার তুলনায় শিক্ষার অভাব মেয়েদের স্বীয় সত্তার বিকাশে সর্বাধিক অন্তরায়। তিনি বলেন, "সম্প্রতি আমরা যে এমন নিস্তেজ, সঙ্কীর্ণমনা ও ভীরু হইয়া পড়িয়াছি, ইহা অবরোধে থাকার জন্য হয় নাই -শিক্ষার অভাবে হইয়াছে।"[২৪] মানবসত্তার পূর্ণ বিকাশে শিক্ষার অপরিহার্যতার বহু উল্লেখ রয়েছে রোকেয়ার রচনাসমূহে। তিনি শিক্ষার্থীকে কেবল ছকে বাঁধা পুঁথি পাঠে অভ্যস্থ করতে চাননি। তিনি বলেন, কেবল পাস করা বা চাকুরি পাওয়া শিক্ষা বা শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। শিক্ষার্থীর শারীরিক মানসিক সর্বাঙ্গীন বিকাশকেই রোকেয়া শিক্ষা বলে মনে করেন। তাই তিনি শারীরিক শিক্ষা, কৃষিবিদ্যা, গার্হস্থ্যনীতি, প্রাথমিক চিকিৎসা শিক্ষা, স্বেচ্ছাসেবাসহ চারুকলা, সঙ্গীত ও নাট্যকলাকে সহপাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেন। শিক্ষা প্রসঙ্গে রোকেয়ার চিন্তা পদ্ধতিগত, সুবিন্যস্ত এবং বাস্তব লক্ষ্য সাধনের উপযোগী। সময়ের প্রয়োজনে শিক্ষালাভ, জীবিকা গ্রহণ, নাগরিক অধিকার প্রভৃতি নারীর জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল–তা রোকেয়া যথার্থই অনুধাবন করেন। প্রকৃতপক্ষে রোকেয়ার সমকালে শিক্ষার অধিক বড় কোনো হাতিয়ার ছিল না যা দ্বারা মুসলিম সমাজের নারীর চলার পথকে সুগম করা যায়। রোকেয়া তাই শিক্ষাকে সমাজ পরিবর্তনের অমোঘ অস্ত্র রূপে গ্রহণ করে আমৃত্যু নিজের কর্মতৎপরতা চালিয়ে গেছেন।

রোকেয়া সমাজকে দেখেছেন বিশ্লেষকের দৃষ্টিতে। উদ্‌ঘাটন করেছেন সামাজিক সমস্যার স্বরূপ। আর সেই সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায়ও তিনি নির্দেশ করেছেন। তিনি সমাজদেহের পঙ্কিলতা অপসারণে যেমন যত্নবান হয়েছেন তেমনি বিদ্যমান কুপ্রথার অযৌক্তিকতাগুলো তুলে ধরেছেন। রোকেয়া তাই একাধারে সমাজ দার্শনিক, সমাজ সাংস্কারক ও সমাজসেবী। সমকালের সমাজ বিশ্লেষণে রোকেয়ার

চোখে ধরা পড়ে মুসলিম পুরুষ সমাজের মনোভাব, নারীর অনগ্রসরতার কারণ, নারীমুক্তির উপায় ও সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা করে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কৌশল। রোকেয়া লক্ষ্য করেন, হিন্দু নারীসমাজের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ, জীবিকা গ্রহণ, এমনকি আন্দোলন সংগ্রামে অংশ গ্রহণ মুসলিম পুরুষদের আরও বেশি রক্ষণশীল করে তুলেছে। তারা বংশগৌরব, ধর্ম, পর্দা, নিরাপত্তা প্রভৃতি বিষয়গুলোকে হাতিয়ার করে নারীদের অন্তঃপুরে আবদ্ধ রাখার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। জ্ঞানালোক যাতে সেখানে প্রবেশ না করে তার জন্যও রয়েছে পুরুষের সর্তকতা। রোকেয়া বলেন, "আমাদের শয়নকক্ষে যেমন সূর্যালোক প্রবেশ করে না, তদ্রূপ মনোকক্ষেও জ্ঞানের আলো প্রবেশ করিতে পারে না। ...স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে অধিকাংশ লোকের কেমন একটা কুসংস্কার আছে যে তাঁহারা "স্ত্রীশিক্ষা" শব্দ শুনিলেই "শিক্ষার কুফলের" একটা ভাবী বিভীষিকা দেখিয়া শিহরিয়া উঠেন।"[২৫] নারীর উন্নতি রক্ষণশীল পুরুষ সমাজের কাছে কর্তৃত্ব হারানোর ভয়ে পরিণত হয়েছিল। ফলে অন্যান্য সময়ের তুলনায় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য দশকে মুসলিম পুরুষ সমাজ অধিকমাত্রায় রক্ষণশীল হয়ে উঠেছিল। রোকেয়ার বিভিন্ন লেখায় সে কথার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, "পুরুষগণ স্ত্রী জাতির প্রতি যতটুকু সম্মান প্রদর্শন করেন, তাহাতে আমরা সম্পূর্ণ তৃপ্ত হইতে পারি না।"[২৬]

রোকেয়া সমাজ সংস্কারে ও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে যে সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছেন, সে ক্ষেত্রে তিনি বহু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের শিকার হয়েছেন। কিন্তু সমদর্শী ও সমাজসচেতন এই ব্যক্তিত্ব পুরুষকে কখনই নারীর প্রতিপক্ষ ভাবেননি। তিন যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন, উভয়ের সম্মিলনে যেমন সমাজ গঠিত হয় তেমনি উভয়ের উন্নতিতেই কেবল সমাজের সত্যিকার উন্নয়ন সম্ভব। শিক্ষায়, জ্ঞানে ও কর্মে নারী- পুরুষের মধ্যকার ব্যবধান যে অযৌক্তিক রোকেয়া সমাজ বাস্তবতার আলোকে তা ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি এই বিষয়টিকে বহু রকম উদাহরণ ও শ্লেষ মিশ্রিত যুক্তির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, নারী ও পুরুষ যদি একটি গাড়ির দুইটি চাকা স্বরূপ হয়, তাহলে গাড়িকে সচল রাখতে চাকাদ্বয়ের সমান হওয়া আবশ্যক। অন্যথায় ভারসাম্যহীনতার কারণে গাড়ির পতিত হওয়ার আশঙ্কাই বাস্তবে পরিণত হয়। তাই সমাজে কেবল পুরুষকে শিক্ষিত বা সময়োপযোগী হয়ে উঠলেই চলবে না; নারীকেও সমানভাবে শিক্ষিত ও সচেতন হতে হবে। রোকেয়া উপলব্ধি করেন, সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধি নারীর সচেতনতা বৃদ্ধির এক বিশেষ উপায়। তিনি বলেন, "অন্তঃপুরিকাদের পরস্পর দেখাশুনা বৃদ্ধি হওয়া বাঞ্ছনীয়। পুরুষরা যেমন সকল শ্রেণীর লোকের সহিত আলাপ করিয়া থাকেন, আমাদের তদ্রূপ করা উচিত।"[২৭] নারীর অগ্রগতির আন্দোলনে পুরুষ সমাজের নীরবতাকে রোকেয়া তিরস্কার বা ধিক্কার জানাননি। তিনি বলেছেন নিজেদের উন্নতির দায় নারীকেই বহন করতে হবে। অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে নারীকেই। তবে মুক্তমনা পুরুষ ব্যক্তিত্বের সহযোগিতাকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন। রোকেয়া উপলব্ধি করেন, এ কাজে পুরুষেরও সহযোগী হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। তিনি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলেন:

> অদূরদর্শী পুরুষেরা ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষার জন্য এতদিন আমাদিগকে শিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখিতেন। এখন দূরদর্শী ভ্রাতাগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে ইহাতে তাহাদের ক্ষতি ও অবনতি হইতেছে। তাই তাঁহারা জাগিয়া উঠিতে ও উঠাইতে ব্যস্ত হইয়াছেন। ...একটিকে ছাড়িয়া অপরটি সম্পূর্ণ উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না...।[২৮]

সমাজ সংস্কারে রোকেয়া ধর্মের নামে প্রবর্তিত অনেক কুপ্রথার যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে পর্দার অজুহাতে নারীকে গৃহে আবদ্ধ রাখা ধর্মসম্মত নয়। পর্দার অর্থ যে গৃহ প্রাচীরে আবদ্ধ থাকা নয়, রোকেয়া তা চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর 'বোরকা' প্রবন্ধে। প্রকৃতপক্ষে পর্দার নামে নারীকে অবরুদ্ধ রাখার এই হীন কৌশল ইসলামের পরিপন্থী। রোকেয়া বলেন, "পর্দা অর্থে তো আমরা বুঝি গোপন করা বা হওয়া, শরীর ঢাকা ইত্যাদি– কেবল অন্তঃপুরের চারি–প্রাচীরের ভিতর থাকা নহে। এবং ভালমতে শরীর আবৃত না করাকেই "বে–পর্দা" বলি।"[২৯] তিনি নারীদের পোশাক ও বোরকার উন্নতি বিধানের কথা বলেন। তিনি

বলেন, নারীর জন্য এমন পোশাক প্রয়োজন যাতে তারা সাবলীলভাবে শালীনতার সাথে বাইরে চলাচল করতে পারে। হিন্দু সমাজে এরকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন ঠাকুর পরিবারের জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে রোকেয়া পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যা সন্তানের অধিকার বিষয়েও কথা বলেন। এক্ষেত্রে পুরুষজাতি ইসলামের বিধান পরিপূর্ণভাবে না মেনে মেয়েদের বঞ্চিত করছে বলে রোকেয়া মনে করেন। পুরুষ সমাজ কর্তৃক ধর্মীয় বিধানকে নিজ স্বার্থে এভাবে ব্যবহারের সমালোচনা করেন রোকেয়া।

নারীর সামাজিক সমস্যা প্রসঙ্গে রোকেয়ার ভাবনা ছিল তাঁর সমকালের চেয়ে অগ্রগামী। রোকেয়া নারী সমাজের নাগরিক অধিকার আদায়েও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি মনে করেন, নারীর ভোটাধিকার প্রাপ্তি সমাজের জন্য মঙ্গলজনক। নারীর ভোটাধিকারের দাবীতে কামিনী রায়ের উদ্যোগে ভাইসরয় লর্ড লিটনের সাথে সাক্ষাৎকারের জন্য যে প্রতিনিধি দল গঠন করা হয় রোকেয়া ছিলেন তার একজন সদস্য। ১৯২৩ সালে নারীর ভোটাধিকারের দাবীতে রোকেয়ার কর্মতৎপরতা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে রোকেয়া অনুভব করেন মুসলিম নারীদের সংঘবদ্ধভাবে নিজেদের অধিকার আদায় ও সমাজ সংস্কারে অগ্রসর হওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্যে তিনি 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম' (১৯১৬) নামে একটি মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। সমাজ সংস্কারে রোকেয়া নারীকে শুধু অধিকার আদায়ের কথা বলেননি, নিজেকে ঐ অধিকার ভোগের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার পরামর্শও দিয়েছেন। রোকেয়ার বিশেষত্ব এখানে যে, তিনি নারীকে শাশ্বত বঙ্গ নারীর আদর্শ অনুলিপি না হয়ে তাকে পূর্ণ মানুষ হতে বলেছেন। অন্য নারী সমাজ সংস্কারকগণ যখন নারীকে কেবল আদর্শ স্ত্রী অথবা আদর্শ জননী হওয়ার পরামর্শ দেন তখন রোকেয়া তুলে ধরেন ভিন্ন কথা। গোলাম মুরশিদ অন্য সমাজসংস্কারকদের থেকে রোকেয়ার ভিন্নতা প্রসঙ্গে বলেন:

> ঐতিহ্যিক ভূমিকাকে অক্ষুন্ন রেখে নারী হিসেবে পুরুষদের হাতে আরও বেশি শোষিত হওয়ার, পুরুষদের জন্যে তাঁদের আরও উপযোগী হয়ে ওঠার পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা। আত্মবিকাশ নয়, সমাজের নামে আত্মত্যাগের আদর্শে তারা বিশ্বাসী। গৃহকর্ম, রন্ধন, সন্তান পালন, পরিজনের যত্ন ইত্যাদিকে রোকেয়াও নারীর কর্ম বলে আখ্যায়িত করেছেন, কিন্তু নারীর জীবন যে এতেই সীমাবদ্ধ নয়, এটা তিনি বিশেষ জোর দিয়েই বলেছেন।[৩০]

সমাজকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য রোকেয়া নারীকে ভগ্নী–জায়া–জননী সকল রূপেই পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠতে বলেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, সন্তানের নৈতিক চরিত্র ও সামাজিক গুণাবলীর ভিত রচিত হয় পরিবারে। আর জননীর ভূমিকাই এখানে প্রধান। আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য তিনি সত্যবাদিতা, পরিচ্ছন্নতা বোধ, সেবাপরায়ণতা, প্রতিবেশীর প্রতি সদয় ব্যবহার ইত্যাদি গুণগুলো নারীকে আয়ত্ত করতে বলেন। এরূপ আত্তীকরণ নারীকে স্বাধীনতা লাভের জন্য উপযুক্ত করে তুলবে বলে রোকেয়া মনে করেন।

নারীজাগরণে রোকেয়ার ভূমিকা পূর্ণরূপে তুলে ধরা এখনও গবেষণা সাপেক্ষ। কোন সোনারকাঠি–রূপারকাঠির স্পর্শে ঘুমন্ত মুসলিম সমাজের রাজকন্যা রোকেয়া নিজে জেগেছিলেন আর সকলকে জেগে ওঠার মন্ত্র শিখিয়েছিলেন তা আজও অনেকাংশে অজানা রয়ে গেছে। তাঁর সম্পর্কে অল্পকথায় যেটুকু বলা যায় তা হলো, তিনি তাঁর সময়ের চেয়েও অনেক বেশি অগ্রগামী এবং অপরাপর অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্বের তুলনায় একান্তই স্বতন্ত্র। ব্যক্তি জীবনের দুঃখ, যাতনা, একাকীত্ব আর কর্মময় জীবনে সমাজের বিষদৃষ্টি– সবকিছুর মধ্যে রোকেয়া পরম সহিষ্ণুতার সাথে আপোসহীনভাবে কাজ করে গেছেন। তিনি কেবল মুসলিম নারী সমাজের জন্য কাজ করেছেন এমন নয়। তিনি সকল কালের সকল দেশের নারীর বঞ্চনাকে চিত্রিত করেছেন এবং তার প্রতিবাদ করেছেন। তিনি নারীর স্বকীয়তা ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার উপায় নির্দেশ করেছেন। প্রকৃতই যদি রোকেয়ার আদর্শ অনুসরণ করা যেতো তাহলে পৃথিবীটা পূর্ণ নারীস্থান হয়ে না উঠলেও নর-নারীর সাম্যাবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতো। একবিংশ

শতাব্দীতেও রোকেয়ার বিজ্ঞানমনস্কতা, যুক্তিনিষ্ঠা, উদারনৈতিক মনোভাব আমাদের নারী সমাজের অর্ধাংশেও সঞ্চারিত হয়নি। রোকেয়ার চিন্তা-ভাবনার যথাযথ চর্চার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। শিক্ষিত নারীর জন্য এখনও যে নৈতিক দায়িত্বের দায় রয়ে গেছে তা হলো–রোকেয়ার বার্তা আমাদের অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত সকল নারীর নিকট পৌঁছে দেওয়া।

টীকা ও তথ্য নির্দেশ

[১] রমেশ বন্দোপাধ্যায় (অনু), *মনুসংহিতা*, (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৭), ৯/৩, পৃ. ২৪৮।
[২] পূরবী বসু, *আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বাংলার নারী*, (ঢাকা: বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ২০১৭), পৃ. ৩৩।
[৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪।
[৪] অধ্যাপক মো. আব্দুল মান্নান, সামসুন্নাহার খানম মেরী, *নারী ও রাজনীতি*, (ঢাকা: অবসর প্রকাশন সংস্থা, ২০০৬), পৃ. ৩।
[৫] কনক মুখোপাধ্যায়, *নারী আন্দোলনের নানা কথা*, (কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০১), পৃ. ১৩-১৪।
[৬] কনক মুখোপাধ্যায়, *নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা*, (কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৯৩), পৃ. ১৬।
[৭] শাহানারা হোসেন, *উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলিম নারী রোকেয়ার নারীবাদ ও তার ধারাবাহিকতা*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, জুন, ২০১৪), পৃ. ১৩৮।
[৮] মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, *আমি নারী*, (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৪), পৃ. ৭৪।
[৯] অর্ধাঙ্গী, আবুল কাসেম ফজলুল হক (সম্পা.), *বেগম রোকেয়া রচনাবলি*, (ঢাকা: ভাষা প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ২০১৮), পৃ. ৪৯।
[১০] শাহানারা হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮।
[১১] বিস্তারিত দেখুন: মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০২), পৃ. ৩৮।
[১২] শাহানারা হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৮-১৩৯।
[১৩] বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা সমিতি [সভানেত্রীর অভিভাষণ], *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫০।
[১৪] স্ত্রীজাতির অবনতি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০।
[১৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০-৪১।
[১৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২।
[১৭] বোরকা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬।
[১৮] স্ত্রীজাতির অবনতি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১-৪২।
[১৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২।
[২০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯।
[২১] বোরকা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩।
[২২] বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা সমিতি [সভানেত্রীর অভিভাষণ], *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫২।
[২৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৫।
[২৪] বোরকা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬।
[২৫] স্ত্রীজাতির অবনতি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮।
[২৬] অর্ধাঙ্গী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭।
[২৭] বোরকা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫।
[২৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬।
[২৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩।
[৩০] গোলাম মুরশিদ, *রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া*, (ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ২য় মুদ্রণ, ২০১৮), পৃ. ১৮৬।